ইসলামী

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

ইসলামী
শিক্ষা ও সংস্কৃতি

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
ঢাকা-১০০০।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৫

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

মুদ্রণ :
মীম প্রিন্টার্স
কাঁটাবন, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : পনের টাকা মাত্র

Islami Shikhya O Sanskriti written and published by AKM Nazir Ahmad
Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Complex Dhaka-1000.
First Edition February 2005. Price : Taka 15.00 only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

আল্লাহ-বিমুখতা পৃথিবীতে জেঁকে বসেছে বিপুলভাবে। আল্লাহ-বিমুখতার অনিবার্য পরিণতি রূপে মানব জীবনে এখন অসংখ্য সমস্যার ভীড়। জীবনের সকল দিকেই জটিলতা আর জটিলতা। সকল ক্ষেত্রেই বিশৃংখলা।

বিশৃংখলার দাপট শিক্ষা অংগনেও। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন দেশে হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। কিন্তু মানুষের উপযোগী পূর্ণাংগ শিক্ষা ব্যবস্থা কোথাও তো দৃষ্ট হচ্ছে না। খিলাফাতের সুমহান কর্তব্য পালনে যোগ্য মানুষ গড়ার কাংখিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সমাজ ও সভ্যতায় বিকৃতির বিস্তার ঘটিয়ে চলছে।

বিরাটভাবে বিকৃত হয়ে গেছে সংস্কৃতি। নোংরামী, ভাঁড়ামী আর ছ্যাবলামীর ওপর এখন 'সংস্কৃতি' পরিভাষার লেবেল। শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম অপ-সংস্কৃতিকেই সংস্কৃতি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীকে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য যাদের আবির্ভাব, তারাও আজ দিশাহারা।

আল্লাহ-বিমুখ জীবন দর্শনের প্রচণ্ড চাপে তারা এখন নতজানু। পরানুকরণ করে জাতে ওঠার এক হীন মানসিকতা তাদেরকে পেয়ে বসেছে।

অথচ তাদের আছে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন। আছে স্বকীয়তা, যা এখন উপেক্ষিত। তারা যদি আবারো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় তাহলে রঞ্জিত হতে হবে আল্লাহর রঙে। আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে আল্লাহ-বিমুখতার বিরুদ্ধে। অবশ্যই বিজ্ঞজনোচিতভাবে।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার যা বুঝ-সমঝ তা তুলে ধরছি এই পুস্তিকায়। আমার বুঝ-সমঝে কোন ভুল থেকে থাকলে তা শুধরে নেবার তাওফীক চাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে। আর এতে যদি কোন ভুল না থাকে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্য ভাই-বোনদেরকে এর সাথে একমত হওয়ার তাওফীক দিন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

ইসলামী শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা মানে জ্ঞান-চর্চা।

দৃশ্যমান জীবকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই জ্ঞান-চর্চা প্রয়োজন।

অন্যান্য জীবের জন্য সহজাত জ্ঞানই (সহজাত বুদ্ধি, সহজাত প্রবৃত্তি) যথেষ্ট।

তাদেরকে মানুষের মতো জ্ঞান-চর্চা করতে হয় না। প্রয়োজন পড়ে না।

জ্ঞানের দু'টো ভাগ

জ্ঞান প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. পরিবেশ-পরিমণ্ডলের জ্ঞান।

অর্থাৎ মানুষের চারপাশে বিদ্যমান বস্তু ও জীবজগতের জ্ঞান।

দুই. নীতি-জ্ঞান।

অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য ও অ-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান।

দু'টো জ্ঞানই মানুষের প্রয়োজন

পরিবেশ-পরিমণ্ডলের জ্ঞান না হলে মানুষের চলেনা।

তেমনিভাবে নীতি-জ্ঞান না হলেও মানুষের চলেনা। দু'টো জ্ঞান যুগপৎ মানুষের প্রয়োজন।

মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত দু'টো জ্ঞানের একটি চর্চা করে এবং অপরটিকে উপেক্ষা করে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে উভয়বিধ জ্ঞানের সমন্বিত চর্চার ওপর।

জ্ঞানের উৎস

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জ্ঞানময় সত্তা।
তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস।

আল্লাহ্ মানুষের পরিবেশ পরিমণ্ডলের জ্ঞানের উৎস।

আল্লাহ্ মানুষের নীতি-জ্ঞানের উৎস।

আল্লাহ্ প্রথম মানুষ আদমকে (আ) সৃষ্টি করে তাঁর পরিবেশ পরিমণ্ডলের সকল কিছুর নাম-পরিচয় জানিয়ে দেন।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا...

আল বাকারা ॥ ৩১

"এবং তিনি আদমকে সকল কিছুর নাম-পরিচয় জানিয়েছেন।"

এই সবকিছু সম্পর্কে আদমকে (আ) এতোখানি ব্যাপক জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো যতোখানি জ্ঞান আর কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। সেই জন্যই তো জ্ঞান প্রতিযোগিতায় আদম (আ) ফিরিশতাদের ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল'আলামীন প্রথম মানুষ আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে কিছুকালের জন্য একটি বাগানে অবস্থান করতে দেন। সেখানে ছিলো নানা প্রকারের খাদ্য, ফলফলাদি ও পানীয়র প্রাচুর্য। তাঁদেরকে পরানো হয়েছিলো আরামদায়ক পোষাক। আবার রোদ থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে দেয়া হয়েছিল চমৎকার গৃহ।

এই সম্পর্কে আলকুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَتَعْرٰى. وَاِنَّكَ لاَتَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَتَضْحٰى.

তা-হা ॥ ১১৯

"এখানে তুমি অভুক্ত থাকছো না, উলংগ থাকছো না, পিপাসার্ত থাকছো না এবং রৌদ্রক্লিষ্ট হচ্ছো না।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রী অন্ন, বস্ত্র, পানীয় ও বাসস্থান লাভ করেন। এই জন্য তাঁদেরকে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি। আবার, এইসব নিয়ামতের কোন্‌টি খেতে হবে এবং কোন্‌টি পান করতে হবে, কোন্‌টি পরতে হবে এবং কোন্‌টিতে বাস করতে হবে সেই জ্ঞানও তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিলো।

পরিবেশ পরিমণ্ডলের এই জ্ঞানই প্রথম জ্ঞান যা মানুষকে দেয়া হয়েছিলো।

উল্লেখ্য যে "রৌদ্রক্লিষ্ট হচ্ছোনা" কথাটি আমাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদমকে (আ) যেই জান্নাত বা বাগানটিতে থাকতে দিয়েছিলেন সেটি এই সৌরজগতেরই কোথাও অবস্থিত যেখানে সূর্যের কিরণ পড়ে থাকে। আবার, এই কথাও আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে মহাবিশ্বের সূর্য (তথা তারকা) তো একটি নয়, কোটি কোটি। কাজেই এখানে যেই সূর্য কিরণের দিকে ইংগিত করা হয়েছে তা আমাদের অতি চেনা সূর্যের কিরণ এমনটি নিশ্চিত করে বলার কোন সুযোগ নেই।

আরো উল্লেখ্য যে, পরিবেশ পরিমণ্ডলের যেই মৌলিক জ্ঞান আদমকে (আ) দেয়া হয়েছিলো সেই জ্ঞানকে পরিবর্ধিত করার যোগ্যতাও তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। আর এই যোগ্যতাই বংশানুক্রমে আদম-সন্তানেরা লাভ করেছে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদমকে (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত বা বাগানে অবস্থান করতে দিয়ে বলেছিলেন,

يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَلاَتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

আল বাকারা ॥ ৩৫

"ওহে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী এই বাগানে বসবাস করতে থাক, যেখান থেকে ইচ্ছা তৃপ্তিসহকারে খাদ্য গ্রহণ করতে থাক। তবে এই যে গাছটি, এর কাছেও ঘেঁষোনা। যদি ঘেঁষ তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে ঘুরে ফিরে বেড়াতে বলেন, তৃপ্তি সহকারে ফলফলাদি খাদ্য গ্রহণ করতে বলেন, আর নিষেধ করে দেন একটি গাছের নিকটবর্তী হতে, এর ফল খেতে। আল্লাহ আরও জানিয়ে দেন, যদি তাঁরা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লংঘন করেন তাহলে তাঁরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আল্লাহর বিরাগভাজন হবেন।

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে এই জ্ঞান দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মানা তাঁদের ইতিবাচক কর্তব্য এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বিরত থাকা তাঁদের নেতিবাচক কর্তব্য।

আর এটাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক মানুষকে দেয়া প্রাথমিক নীতি-জ্ঞান।

অর্থাৎ মানুষের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের জ্ঞান ও নীতি-জ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞানের উৎস আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

আল 'আলাক ॥ ৫

"তিনি (আল্লাহ) মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

জ্ঞানের বিস্তৃতি

পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতিনিধিরূপে সুমহান কর্তব্য পালনের জন্যই মানুষের সৃষ্টি। প্রথম মানুষ আদমকে (আ) সৃষ্টি করার প্রাক্কালে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ফিরিশতাদেরকে তাঁর অভিপ্রায় জানাতে গিয়ে ঘোষণা করেন,

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

আল বাকারা ॥ ৩০

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।"

কিছুকালের জন্য আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে রাখা হয়। ইবলীসের প্ররোচনায় ভবিষ্যতে তাঁরা কিভাবে বিপদগ্রস্ত হবেন, সেই সম্পর্কে তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেয়া হয়। অতপর তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় পৃথিবীতে নেমে পড়তে। এই নির্দেশ ইবলীসের জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।

জান্নাতে থাকাকালে আদম (আ) ইবলীসের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে হোঁচট খেয়েছেন। সেই ইবলীসও নামছে পৃথিবীতে। ফলে আদম (আ) সম্ভাব্য বিপদের আশংকায় ভীত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِـعَ هُـدَاىَ فَـلاَ خَـوْف عَلَيْـهِمْ وَلاَهُـمْ يَحْزَنُوْنَ.

আল বাকারা ॥ ৩৮

"অতপর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট হিদায়াত আসবে, যারা তা অনুসরণ করে চলবে তাদের কোন ভয় ও দুঃখ-বেদনার কারণ থাকবেনা।"

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنِ التَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَيَضِلُّ وَلاَيَشْقٰى.

তা-হা ॥ ১২৩

"অতপর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট হিদায়াত আসবে, যেই ব্যক্তি তা মেনে চলবে সে পথভ্রষ্ট হবেনা, দুর্ভাগ্য পীড়িতও হবে না।"

পৃথিবীতে আসার পর আদম (আ) ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশনামা পেতে থাকেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বহু সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে সন্তান লাভ করেন। একটি পরিবার থেকে গড়ে ওঠে অনেকগুলো পরিবার। এইভাবে পৃথিবীর অংগনে মানব সমাজের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনও ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিস্তৃত আকারে নাযিল করতে থাকেন।

পৃথিবীর অংগনে মানুষের সংখ্যা যতোই বাড়তে থাকে, ততোই বড় হতে থাকে তাদের চাহিদার ফিরিস্তি।

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মধ্যেই তাদের চাহিদা সীমাবদ্ধ রইলো না। শিক্ষা, চিকিৎসা, ভাব প্রকাশের সুযোগ, সৌন্দর্য উপকরণ, নিরাপত্তা, যুল্‌মের প্রতিকার, বাহন ইত্যাদিও চাহিদার তালিকায় সংযোজিত হলো।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের চাহিদা পূরণের জন্যই বহুবিধ সম্পদ দিয়ে পৃথিবীকে ভরপূর করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوْهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لاَتُحْصُوْهَا.

ইবরাহীম ॥ ৩৪

"তোমরা যা চাও (অর্থাৎ তোমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন) তা সবই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামাতগুলো গণনা করতে চাও, তা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

পৃথিবীতে আছে বায়ু সম্পদ, মাটি ও শিলা সম্পদ, পানি সম্পদ, উদ্ভিদ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, খনিজ সম্পদ, তাপ ও বিদ্যুৎ সম্পদ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ আহরণ, রূপান্তরিতকরণ, বিনিময়করণ এবং ভোগ-ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাও দান করেছেন।

মানুষের কোন কোন চাহিদা আপনা আপনি পূরণ হয়। কোন কোন চাহিদা মানুষ একক প্রচেষ্টায় পূরণ করতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে অপরাপর মানুষের সহযোগিতা নিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, মানুষের বহুবিধ চাহিদা পূরণের জন্য পরিবার, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সংস্থা এবং রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

এখানেই আসে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণ ও নিশ্চিত করণের জন্য বিধান তৈরির প্রশ্ন। পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণ খুবই জটিল বিষয়।

কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি করা উচিত, কোন্‌টি করা উচিত নয়– নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই এই সব জটিল বিষয়ের সমাধান বের করার ভার আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের ওপর ন্যস্ত করেননি। বরং তিনি নিজেই নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর সমাধান মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যুগেযুগে নবী রাসূলগণ সেই সমাধান মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

আল হাদীদ ॥ ২৫

"আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছি। তাঁদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব (মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা) ও মীযান (সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্য নিশ্চিতকারী মানদণ্ড) যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর নাযিল করেছি লোহা (রাষ্ট্রশক্তি ও সামরিক শক্তি) যার মাঝে রয়েছে বিরাট শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।"

উল্লেখ্য যে, নবী-রাসূলগণ এই সমাধান মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা প্রথমে সংগঠন ও পরে রাষ্ট্র গঠনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে।

জ্ঞান-চর্চার ভিত্তি

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি নাযিলকৃত আল কুরআনে সর্ব প্রথম যেই নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে "ইকরা"। অর্থাৎ "পড়" বা "জ্ঞান-চর্চা কর।"

আর এই নির্দেশের সাথে "বিইস্মিকাল্লাযি খালাকা" বাক্যাংশ জুড়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষের কাছে এই কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, জ্ঞান-চর্চা হতে হবে আল্লাহ কেন্দ্রিক। কেননা, একমাত্র আল্লাহ কেন্দ্রিক জ্ঞান-চর্চাই মানুষের জন্য কল্যাণকর। তার মানে, আল্লাহ বিমুখ জ্ঞান-চর্চা কিছুতেই মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর হিদায়াতকে জ্ঞান-চর্চার ভিত্তি বানানো।

জ্ঞান-চর্চার গুরুত্ব

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

ফাতির ॥ ২৭, ২৮

"তুমি কি দেখছো না আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষাণ। অতপর আমি এর সাহায্যে নানা রঙের ফল বের করি। পাহাড়ের মধ্যেও রয়েছে নানা রঙের– সাদা, লাল, কালো রেখা। মানুষ, জীব-জন্তু ও গৃহপালিত পশুগুলোরও রয়েছে নানা রঙ। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

এখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আসমান থেকে পানি বর্ষণ, এর সাহায্যে নানা রকমের ফলোৎপাদন, পাহাড়ের রঙ বৈচিত্র এবং মানুষ-জন্তুজানোয়ার-গৃহপালিত পশুর বর্ণ বৈচিত্রের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপ আরো বহু আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবী ও মহাবিশ্বে বিরাজমান বহু সংখ্যক সৃষ্টির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে তারা ঐগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। কেননা, চিন্তা-গবেষণা করে মানুষ যখন ঐগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তখনই তো বলতে বাধ্য হয় :

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً.

"ওহে আমাদের রব, আপনি তো এটি নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।"

আলে ইমরান ॥ ১৯১

মানুষ মুক্ত মন নিয়ে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে এই সব কিছুর পেছনে এক মহা শক্তিধর, মহাজ্ঞানী ও মহাপারদর্শী সত্তা বিরাজমান।

আর যেই সব ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে আল্লাহর শক্তিমত্তা, বিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে-অবহিত হন, এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন।

আল্লাহ বলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوْ الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আলে ইমরান ॥ ১৮

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর ফিরিশতা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা, যারা ন্যায়পরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেই পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

ফিরিশতাগণ হচ্ছেন আল্লাহর বিশাল বিশ্ব সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তারা সাক্ষ্যদেন যে এই বিশ্ব-সাম্রাজ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান চলেনা এবং আল্লাহ ছাড়া কোথাও আর এমন কোন শক্তি নেই যার কাছ থেকে বিধান গ্রহণ করা যায়।

মানুষের মধ্যে যাঁরা সৃষ্টি জগতের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার মতো জ্ঞানের অধিকারী তাঁদেরও সাক্ষ্য এটাই যে মহাবিশ্বের মালিক, বিধানদাতা ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন।

অর্থাৎ বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর একমাত্র ইলাহ (সার্বভৌম বিধানদাতা) হওয়া সম্পর্কে নিঃসংশয় করে তোলে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۙ وَيَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

সাবা ॥ ৬

"এবং জ্ঞানবান লোকেরা ভালো করেই বুঝে যে, যা কিছু তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা প্রশংসিত মহাপরাক্রমশালী সত্তার পথ দেখায়।"

অর্থাৎ সঠিক অর্থে যাঁরা জ্ঞানবান তাঁরা সহজেই বুঝে নেন যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি নাযিলকৃত আল কুরআন নির্ভুল জ্ঞানে পরিপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য এই নির্ভুল জ্ঞানকেই জীবনে চলার পথের পাথেয় বানানো। কারণ এই নির্ভুল জ্ঞানের অনুসরণই মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার উপায়।

আল্লাহ আরো বলেন ,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

আল মুজাদালাহ ॥ ১১

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা অতীব উন্নত মর্যাদার অধিকারী।"

অর্থাৎ যেই সব ব্যক্তি খাঁটি ঈমানের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আল কুরআনে উপস্থাপিত জ্ঞানেও পারদর্শিতা অর্জন করেন তাঁদের মর্যাদা বিরাট। তাঁরা নিজেরা তো কল্যাণ পেয়েই থাকেন, তাঁদের নিকট থেকে সঠিক জ্ঞান হাছিল করে উপকৃত হয় আরো অনেক মানুষ।

জ্ঞান বিতরণের উপায়

জ্ঞান বিতরণের দুইটি প্রধান উপায় হচ্ছে বাক শক্তি ও কলম।

আল্লাহ বলেন,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

আর রাহমান ॥ ৩, ৪

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি মানুষকে কথা বলা শিখিয়েছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে বাক-শক্তি দান করেছেন। এই বাক-শক্তির সাহায্যে একজন মানুষ অপরাপর মানুষের কাছে জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ,

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

আল 'আলাক ॥ ৪

"যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন যার সাহায্যে একজন জ্ঞানী মানুষ জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং অপরাপর মানুষের কাছে লিপিবদ্ধভাবে সেই জ্ঞান পৌছিয়ে দেন।

জ্ঞান বিতরণের এই দুইটি উপায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি উপায় আল্লাহর দান, আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।

শিক্ষাব্যবস্থা

কোন মানবগোষ্ঠী তাদের বংশধরদেরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য যেই ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাকেই বলা হয় শিক্ষাব্যবস্থা।

দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থা

পৃথিবীর জীবন মানব জীবনের একটি স্বল্প পরিসর অধ্যায়। পৃথিবীর জীবন মৃত্যুযুক্ত জীবন। এরপর মানুষকে প্রবেশ করতে হয় জীবনের আরেকটি অধ্যায়ে। জীবনের সেই অধ্যায়ের নাম আখিরাত।

আখিরাতের জীবন মৃত্যুহীন জীবন, অনন্ত জীবন। সেই জীবনে যারা কষ্টের মধ্যে পড়বে তারা চরমভাবে ব্যর্থ। সেই জীবনে যারা সুখ লাভ করবেন, তাঁরাই কামিয়াব।

অনন্ত জীবনে সুখী হবেন তাঁরাই যাঁরা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর অনুগত বান্দা ও নিষ্ঠাবান প্রতিনিধি রূপে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে থেকে মৃত্যু বরণ করেন।

অতএব যেই শিক্ষাব্যবস্থা শুধু পৃথিবীর জীবনের কল্যাণই নয়, আখিরাতের জীবনের সীমাহীন কল্যাণ লাভের জন্যও মানুষকে তৈরি করে এবং মানুষের মাঝে সর্বাবস্থায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেবার, আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেবার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য

পূর্বোক্ত আলোচনার নিরিখে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

শিক্ষার্থীদের মাঝে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবন গড়ার দৃঢ় মনোভংগি, পার্থিব উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহারের দক্ষতা এবং সমাজ ও সভ্যতায় অবদান রাখার মতো যোগ্যতা সৃষ্টিই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য।

শিক্ষার উপকরণ

১. আল কুরআন

আলকুরআনে রয়েছে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, শক্তিমত্তা ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে বিশ্বজাহান সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে আল্লাহর বহুসংখ্যক সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে মানুষ সৃষ্টির সূচনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে পৃথিবীর অংগনে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে মৌলিক দিক নির্দেশনা।

এতে রয়েছে কোন জাতির উত্থান সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে আল্লাহর নাফরমান জাতিগুলোর ধ্বংস-প্রাপ্তির বিবরণ।

এতে রয়েছে মহাবিশ্বের ধ্বংস-প্রাপ্তি এবং নতুন বিন্যাসে নতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান।

এতে রয়েছে মানব জীবনের অনন্ত অধ্যায় সম্পর্কে জ্ঞান।

আলকুরআন জ্ঞানের বিশাল খনি।

মহামহিম আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্যই এই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার নাযিল করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

... وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهٖ.

আবু সায়ীদ (রা)।

জামে আত্ তিরমিযী।

"এবং সমগ্র সৃষ্টির ওপর আল্লাহর যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, সমস্ত কালামের ওপর আল্লাহর কালামেরও তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব।"

অতএব আলকুরআনই হতে হবে জ্ঞান-চর্চার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপরকণ।

২. আস্ সুন্নাহ

আলকুরআনের সূরা আল জুমুআর ২ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) বড়ো বড়ো দু'টো কাজ উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"এবং যাতে সে তাদেরকে "আলকিতাব" শিক্ষা দেয়, আর শিক্ষা দেয় "আলহিকমাত"।

এখানে "আলকিতাব" মানে আলকুরআন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম প্রধান কাজ ছিলো আল কুরআনেরই জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা।

তদুপরি আল কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাও তাঁর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর আলকুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তাঁর মনগড়া ছিলোনা। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনই তাঁকে শিখিয়েছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

আল কিয়ামা ॥ ১৯

"অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব।"

"আলহিকমাত" মানে "আস্ সুন্নাহ" অর্থাৎ আল কুরআনের প্রায়োগিক রূপ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, এর বিভিন্ন বিধানের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, সেই নিরিখে একদল মানুষ গড়ে তুলেছেন এবং বিনির্মাণ করেছেন একটি অনুপম সমাজ।

তিনি তাহারাত, ছালাত, ছাওম, যাকাত, হাজ, দাওয়াত, পরিবার গঠন, রাষ্ট্রগঠন, শিক্ষা সম্প্রসারণ, আইন প্রণয়ন, বিচার-ফায়সালাকরণ, দণ্ডদান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থা বিন্যস্তকরণ, সামরিক শক্তি অর্জন, যুদ্ধ পরিচালনা, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন, আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আলকুরআনে প্রদত্ত মূলনীতিগুলো বাস্তবায়ন করে আলকুরআনের প্রায়োগিক রূপ দেখিয়ে গেছেন।

অতএব আলকুরআনের পর আস্ সুন্নাহ-ই হতে হবে জ্ঞান-চর্চার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

৩. অন্যান্য পাঠ্য পুস্তক

আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর জ্ঞানের আলোকে জীবন দর্শন, ইতিহাস, ভূ-বিজ্ঞান, নভোবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, ধন বিনিময়বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর রচিত হতে হবে পাঠ্য-পুস্তক। প্রত্যেকটি পুস্তকের অন্ত র্নিহিত ভাবধারা হতে হবে আল্লাহ কেন্দ্রিকতা।

এইভাবে রচিত পাঠ্য পুস্তক হতে হবে জ্ঞান-চর্চার তৃতীয় উপকরণ।

৪. ওডিও ভিডিও উপকরণ

বিভিন্ন বিষয়কে অধিকতর সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য তৈরি হতে হবে নানা প্রকারের ওডিও ভিডিও উপকরণ। এইসব উপকরণ তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর নির্দেশিত সীমারেখা অতিক্রম করা না হয়।

এইভাবে তৈরি ওডিও ভিডিও উপকরণ হতে হবে জ্ঞান-চর্চার চতুর্থ উপকরণ।

পারিবারিক শিক্ষা

"হোম স্কুলিং" বা গৃহে শিক্ষাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই সম্পর্কে আলকুরআনের সূরা আল আহযাবের ৩৪ নাম্বার আয়াতে আমরা চমৎকার দিক-নির্দেশনা পাই।

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط

"আল্লাহর আয়াত" ও "আলহিকমাতের" যেইসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয় সেইগুলো স্মরণ রাখ, অন্যদের নিকট বর্ণনা কর।"

এই আয়াতটিতে নবী পত্নীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাঁরাই তো ছিলেন আদর্শ পরিবারের সদস্যা। তাঁদেরকে আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর জ্ঞান স্মরণ রাখা এবং অন্যদের নিকট তা বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহিলা অংগনে তাঁরাই ছিলেন শিক্ষিকা। বহু সংখ্যক মহিলা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান হাছিল করেছেন। পর্দার বাইরে থেকে বহু সংখ্যক পুরুষও তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সা) সন্তানদেরকে সুশিক্ষিতরূপে গড়ে তোলার জন্য সাহাবীদেরকে তাকিদ করেছেন।

আল্লাহর রাসূলের (সা) সাহাবীদের এক একটি বাড়িও এক একটি শিক্ষালয়ের মতো ছিলো। তাঁদের সন্তানেরা তাঁদের গৃহে-তাঁদের কাছ থেকে, বিশেষ করে তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে, জ্ঞান অর্জন করতো।

প্রকৃতপক্ষে গৃহ-ই হওয়া চাই শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান হাছিলের আলয়।

কচি বয়সে শিশুদেরকে আম্মার সান্নিধ্য বঞ্চিত করে ফেলা সমীচীন নয়। সুপর্দ করা উচিত নয় ভাড়াটে আম্মার হাতে। আর এটা অনস্বীকার্য যে আম্মার চেয়ে বেশি আন্তরিক, বেশি যত্নশীল, বেশি নিঃস্বার্থ ও বেশি দায়িত্বশীল শিক্ষিকা আর কেউ হতে পারেন না। এমন শিক্ষকের স্নেহসিক্ত সান্নিধ্যেই শিশুরা সুষ্ঠুভাবে পেতে পারে তাদের অতীব প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান।

তিন চারটে বছর শিশুদেরকে আম্মার সান্নিধ্যে জ্ঞান চর্চার সুযোগ দেয়াই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

শিশুরা যখন বাল্যে উপনীত হয় তখন তাদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠাতে হয় উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তখন তাদেরকে পরিবার বহির্ভূত শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জ্ঞান-চর্চার বিষয়ও হয় প্রসারিত।

শিক্ষার স্তর

পৃথিবীর জীবনে মানুষের অবস্থানকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। অতএব কর্মজীবনের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করতে লম্বা সময় নেয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ

নয়। সেই জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাঁচ পাঁচটি বছর মেয়াদী তিনটি স্তরে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। এরপর আসবে স্পেশালাইজেশানের পর্যায়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা যেই বিষয়ে ভালো করার সম্ভাবনা, তাদেরকে সেই বিষয়ে স্পেশাল শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে তারা সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রূপে গড়ে ওঠতে পারে।

নারী শিক্ষা

পরিবার মানব সভ্যতার প্রথম বুনিয়াদ।

পরিবার একটি জাতির আদর্শিক দুর্গ।

কোন জাতির অন্য সব দুর্গ তছনছ হয়ে গেলেও পরিবার দুর্গগুলো যদি টিকে থাকে তাহলে সেই জাতি আবার স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

পরিবার পরবর্তী জেনারেশনকে গড়ে তোলার সবচে বেশি কার্যকর ক্ষেত্র।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুধের কৌটা পাঠান না। তিনি আম্মার বুকে দুধের ঝর্ণা সৃষ্টি করেন।

পরিবার পরিসরে আম্মার বুকের দুধ পান করে সন্তানেরা সবলদেহী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্নরূপে গড়ে ওঠে।

আম্মার বুকের দুধ পানকারী সন্তানেরা কৌটার দুধ পানকারী সন্তানের চেয়ে বেশি মেধাবী হয়ে থাকে।

আম্মার দুধ পান করতে পারাটা সন্তানের অধিকার। আর দু'বছর পর্যন্ত সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো আম্মার কর্তব্য।

অর্থাৎ পরবর্তী জেনারেশনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ও অবদান বিরাট।

নারীরা যাতে তাঁদের সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেই জন্য তাঁদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সু-স্ত্রী, সু-জননী, সু-গৃহিনী, সু-আত্মীয়া এবং সু-প্রতিবেশিনী রূপে কর্তব্য পালন করতে হলে তাঁদের অবশ্যই উন্নত মানের শিক্ষা চাই।

নারীরা দৈহিক শক্তির দিক থেকে পুরুষদের সমকক্ষ নন। দৈহিক শক্তির এই তারতম্য আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এর মানে হচ্ছে, যেইসব কাজ কঠোর পরিশ্রম দাবি করে সেইসব কাজ আল্লাহ্ নারীর ওপর চাপাতে চান না।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমাজ ভাংগা ও গড়ার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর যেইসব পুরুষেরা সমাজ ভাংগা ও গড়ার ক্ষেত্রে লড়াকুর ভূমিকা পালন করবেন তাঁদেরকে গড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন নারীকে।

সমাজ ভাংগা ও গড়ার প্রথম শ্রেণীর লড়াকু ব্যক্তি ছিলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। আবার এই লড়াকু ব্যক্তিদেরকে লালন পালন করে যাঁরা সমাজ অংগনে উপহার দিয়েছেন তাঁরা ছিলেন নারী। আর নারী যাতে এই সুমহান কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন সেই জন্যই আল্লাহ্ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ.

আল আহ্যাব ॥ ৩৩

"তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর।"

অনেকেই নারীদের গৃহকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকাকে নারীদের জন্যে অবমাননার বিষয় বলে মনে করেন।

আসলে গৃহ পরিসরে অবস্থান করেই সমাজ ও সভ্যতায় নারী যেই সুদূর প্রসারী ফলপ্রসূ ও মূল্যবান অবদান রাখেন তা বুঝতে হলে গভীর চিন্তা প্রয়োজন। সুক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন, স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

গৃহ-বহির্ভূত কাজের জন্য উপযুক্ত ঐসব নারী যাদের সন্তান হয় না অথবা যাঁরা সন্তান হওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছেন।

হাঁ, আরেক ধরনের নারী বাইরের কাজে অংশ নিতে পারেন। তাঁরা হচ্ছেন ঐসব নারী যাঁরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ উপরকণ ব্যবহার করেন, যাতে সন্তান জন্ম নিয়ে তাঁদের বাইরের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণ নারীদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য ক্ষতিকর। তদুপরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানব বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনায় অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ।

পৃথিবীব্যাপী গৃহ-বহির্ভূত অংগনে কর্মরত নারীদের অবস্থা এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে নারীরা তাঁদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকেন।

নারী ও পুরুষের গঠন-প্রকৃতির পার্থক্য, দৈহিক শক্তির তারতম্য, তাঁদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের দাবি ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে তাঁদের জন্য পৃথক পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করাই বিজ্ঞতার দাবি।

তদুপরি 'আলহিজাবের' নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সহ-শিক্ষা নয়, পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করাও বিজ্ঞতার দাবি।

নারীদেরকে আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে জীবনদর্শন, ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, ধাত্রীবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দান করা প্রয়োজন।

সর্বজনীন শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন।

যাঁদের জ্ঞান নেই তাঁদের কর্তব্য– জ্ঞানবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যাঁরা জ্ঞানবান তাঁদের কর্তব্য যাঁদের জ্ঞান নেই তাঁদের কাছে জ্ঞান বিতরণ করা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআনে প্রদত্ত সর্ব প্রথম নির্দেশই হলো "ইক্‌রা" অর্থাৎ পড় বা জ্ঞান-চর্চা কর।

সূরা আয্‌যুমারের ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ.

"বল, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?"

অর্থাৎ সমান নয়।

অতএব সকলেরই উচিত জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করা।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

আবদুল্লাহ (রা), আবু হুরাইরা (রা.)।

মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা (রহ)।

"সকল মুসলিমের জন্য ফারয জ্ঞান অন্বেষণ করা।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

উসমান ইবনু আফফান (রা)।

সহীহ আল বুখারী, জামে আত তিরমিযী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আন নাসায়ী, সুনানু ইবনু মাজাহ, সুনানু আবীদাউদ।

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আলকুরআন শেখে এবং অপরকে তা শেখায়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ.

আবু হুরাইরা (রা)।

সহীহ মুসলিম।

"যেই ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথ চলে, আল্লাহ্‌ তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ.

আনাস ইবনু মালিক (রা)

জামে আত তিরমিযী।

"যেই ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথে বের হয়, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথে অবস্থান করতে থাকে।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

... اِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرِ.

আবু উমামাহ (রা)।

জামে আত তিরমিযী।

"... অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমান ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ, এমন কি গর্তের পিঁপড়া, এমনকি পানির মাছ ঐ ব্যক্তির জন্য দুআ করতে থাকে যেই ব্যক্তি লোকদেরকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা)।

সহীহ আল বুখারী।

"আমার কাছ থেকে একটি কথা শিখে থাকলেও তা লোকদের নিকট পৌঁছাও।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَءً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা)।
জামে আত তিরমিযী।

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা করেন যেই ব্যক্তি আমাদের কাছ থেকে কোন জ্ঞানের কথা শুনে তা হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ.

আবু হুরাইরা (রা)।

জামে আত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ।

"যেই ব্যক্তিকে কোন ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা গোপন রাখে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

এইভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) মানুষকে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান বিতরণের তাকিদ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) শাসনকালে প্রতিটি মাসজিদও ছিলো জ্ঞান-চর্চাকেন্দ্র।

আল খুলাফাউর রাশিদূনের শাসনকালে শিক্ষার আরো বিস্তৃতি ঘটে।

সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক নিযুক্ত হন। বলিষ্ঠ প্রয়াস চালানো হয় যাতে একজন ব্যক্তিও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত না থাকেন।

আসহাবে রাসূলের কর্মধারাকে নানাভাবে মূল্যায়ন করা যায়। এক মূল্যায়নে বলা যায়, তাঁরা ছিলেন ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী।

সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিলো অসাধারণ।

শিক্ষা লাভ মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে একজন মানুষও এই অধিকার বঞ্চিত না থাকেন।

অবৈতনিক শিক্ষা

নতুন প্রজন্ম একটি পরিবারের জন্য আপদ নয়, সম্পদ।

নতুন প্রজন্ম একটি দেশের জন্যও আপদ নয়, সম্পদ।

অতএব নতুন প্রজন্মের মেধার বিকাশসাধন, তাদের মাঝে দক্ষতা সৃষ্টি, তাদের চরিত্র গঠন এবং তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা যেমনি পরিবারের কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য রাষ্ট্রের।

আগামী দিনগুলোতে যারা বর্তমান প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত হবে তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা বর্তমান প্রজন্মের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য।

নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের থাকে বিরাট ভূমিকা।

জ্ঞান কোন পণ্য নয়।

অতএব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে তাদের কাছে জ্ঞান বিক্রয় করা অন্যায়।

বর্তমান প্রজন্মের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা নতুন প্রজন্মের অধিকার।

আর নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা বর্তমান প্রজন্মের কর্তব্য।

আর এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাই হবে প্রধান।

রাষ্ট্র শিক্ষকদের বেতন দেবে।

রাষ্ট্র শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার উপকরণ দেবে। রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবন করে শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেবে। অর্থাৎ শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট

শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সঠিক মানের শিক্ষক রিক্রুটেড না হলে শিক্ষাঙ্গনে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

আদর্শ শিক্ষাঙ্গন গড়ে তুলতে হলে চাই আদর্শ শিক্ষক। একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর জ্ঞান-সমৃদ্ধ।

তিনি হবেন অনাবিল চরিত্রের অধিকারী।

তাঁর ব্যবহার হবে অমায়িক।

তাঁকে হতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী।

শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি হবেন স্নেহশীল।

তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল।

তাঁর মেজাযে থাকবে ভারসাম্য।

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দেবেন।

কারো প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

কারো প্রতি তিনি বৈরী মনোভাবাপন্ন হবেন না।

তাঁকে হতে হবে মনোবিজ্ঞানী।

তাঁকে হতে হবে শিক্ষাদানে পটু।

সময়ানুবির্ততা হবে তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁর জীবন হবে সুশৃংখল।

তিনি হবেন বিশুদ্ধভাষী।

তিনি হবেন সু-বক্তা।

তিনি হবে বিজ্ঞ আলোচক।

সকল কাজেই তাঁর থাকবে অগ্রণী ভূমিকা।

তিনি হবেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

সঠিক অর্থে আমানদতার।

তিনি হবেন শিক্ষার্থীদের প্রেরণার উৎস।

তিনি যেখানেই যাবেন সেখানেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবেন।

এইসব গুণ-সম্পন্ন শিক্ষকই আদর্শ শিক্ষক। এমন শিক্ষকই তো হতে পারেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর।

অতএব এইসব দিক বিবেচনা করেই শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট করা প্রয়োজন।

শিক্ষাঙ্গন

১. মাসজিদ

শিক্ষাঙ্গনে থাকা চাই একটি সুপরিসর মাসজিদ যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে ছালাত আদায় করতে পারবেন।

২. লাইব্রেরী ও পাঠাগার

শিক্ষাঙ্গনে থাকা প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী এবং সুপরিসর পাঠাগার যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিবিষ্টমনে জ্ঞান চর্চা করতে পারবেন।

৩. বিজ্ঞান গবেষণাগার

শিক্ষাঙ্গনে থাকা চাই একটি উন্নতমানের বিজ্ঞান গবেষণাগার যেখানে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী একই সময়ে প্র্যাকটিকেল ওয়ার্ক করতে পারবেন।

৪. পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাস রুম

শিক্ষাঙ্গনে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম থাকা চাই যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে পাঠ গ্রহণ করবেন।

৫. ওডিটোরিয়াম

শিক্ষাঙ্গনে একটি সুপরিসর ওডিটোরিয়াম থাকা প্রয়োজন যেখানে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কিরায়াত প্রতিযোগিতা, দারসুল কুরআন অনুশীলন, দারসুল হাদীস অনুশীলন, বক্তৃতা অনুশীলন, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।

৬. শরীর চর্চার স্থান

শরীর চর্চার জন্যও সু-বিস্তৃত স্থান থাকা প্রয়োজন।

৭. পার্কিং শেড

যানবাহন রাখার জন্য একটি সুপরিসর পার্কিং শেড থাকা প্রয়োজন।

৮. পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট

সাধারণ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক টয়লেট থাকা প্রয়োজন যাতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী একই সময় তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

৯. ফার্স্ট এইড রুম

একটি ফার্স্ট এইড রুম থাকা প্রয়োজন যেখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ঔষধাদি থাকবে।

১০. প্রশাসনিক কক্ষ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষকবৃন্দ ও অফিস কর্মচারীদের জন্য সংলগ্ন বাথরুমসহ স্বতন্ত্র রুম থাকা প্রয়োজন। তদুপরি রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষিত রুমও থাকা প্রয়োজন।

১১. ওয়েটিং রুম

বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও অন্যান্য ভিজিটার শিক্ষাঙ্গনে এসে থাকেন। তাঁদের সুবিধার্থে সংলগ্ন বাথরুমসহ একটি সুপরিসর ওয়েটিং রুম থাকা প্রয়োজন।

১২. ক্যান্টিন

শুধু শিক্ষাঙ্গনের লোকদের জন্যেই একটি পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিন থাকা চাই।

ক্যান্টিনে যাতে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও পানীয় পরিবেশিত হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৩. পাহারা

শিক্ষাঙ্গনে থাকা চাই বেশ কিছু সংখ্যক চৌকস পাহারাদার। দিনের মতো রাতেও পর্যাপ্ত সংখ্যক পাহারাদার নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন।

১৪. দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ

শিক্ষাঙ্গনের গোটা পরিবেশ হওয়া চাই দৃষ্টি নন্দন।

পরিকল্পিত সবুজ চত্বর ও ফুল বাগান শিক্ষাঙ্গনের সৌন্দর্য নিশ্চিত করতে পারে।

শিক্ষাঙ্গনের এক দিক থেকে অন্য দিকে যাবার ফুটপাতগুলো হতে হবে সু-সমতল ও সুন্দরভাবে তৈরি।

শিক্ষাঙ্গনের কোথাও নোংরা কিছু বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু থাকবে না।

সব কিছুই থাকবে পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন।

শিক্ষার মাধ্যম

মাতৃ-ভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম (medium of instruction)।

তবে জীবন ও জগতের নির্ভুল জ্ঞানের উৎস আল কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, সেহেতু আরবী ভাষাও শেখাতে হবে শিক্ষার্থীদেরকে।

তদুপরি যেই সকল ভাষা পৃথিবীর সুবিস্তৃত অঞ্চলে পরিচিত ও প্রচলিত, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার পছন্দ অনুযায়ী সেইগুলোর যেই কোন একটি শিখবার সুযোগ করে দিতে হবে।

শিক্ষা গবেষণা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জ্ঞানময় সত্তা।

তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছেন।

সন্দেহ নেই, মানুষের জ্ঞান সর্বজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু অপরাপর সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকেই বেশি জ্ঞান দিয়েছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে চিন্তাশক্তি দান করেছেন। এই চিন্তা শক্তি ব্যবহার করে মানুষ একের পর এক পৃথিবী ও আসমানের বহু কিছুর সংগে পরিচিত হচ্ছে, এইগুলোকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। এইভাবে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে জীব ও বস্তুজগতকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে মানুষ এমন সব তথ্য ও উপাত্তের সাথে পরিচিত হচ্ছে যেইগুলো নতুন করে আলকুরআনের বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

জ্ঞান-চর্চার পরিমণ্ডলে নতুন কীসব বিষয় সংযোজিত হলো, সেইগুলোকে শিক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে সন্নিবেশিত করা যায়, পুরোনো কোন্ কোন্ বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর প্রয়োজনীয় নয়, কোন্ কোন্ নতুন বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কিভাবে রচিত হওয়া চাই নতুন পাঠ্যপুস্তক, স্বল্প সময়ে সহজবোধ্যভাবে জ্ঞান বিতরণের জন্য কোন্ কোন্ প্রযুক্তি ব্যবহার করা জরুরী, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মান মূল্যায়নের জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, শিক্ষকদেরকে পারদর্শী শিক্ষকরূপে গড়ে তোলার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্য একটি স্থায়ী শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট থাকা অত্যাবশ্যক।

ইসলামী সংস্কৃতি

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি মানে পরিশীলন, পরিমার্জন, সুসম্পাদন কিংবা সর্বোত্তমরূপে সম্পাদন।

কিন্তু পরিশীলন, পরিমার্জন, সুসম্পাদন কিংবা সর্বোত্তমরূপে সম্পাদনের মাপকাঠি কি?

কোন কাজ কিভাবে করলে, কোন কথা কিভাবে বললে, কোন লেখা কিভাবে লিখলে এবং কোন আচরণ কিভাবে করলে তা পরিশীলিত, পরিমার্জিত, সুসম্পাদিত কিংবা উত্তমরূপে সম্পাদিত বলে স্বীকৃত হবে?

মানবগোষ্ঠীর কাছে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করলে সন্দেহ নেই নানা মুনির নানা মত পাওয়া যাবে।

এমতাবস্থায় কার মত গ্রহণ করা উচিত, কার মত গ্রহণ করা উচিত নয় তা নির্ণয় করাও কঠিন।

কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান মুমিনের জন্য এইগুলো কোন সমস্যাই নয়।

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী শারীয়া অনুমোদিত সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে সর্বোত্তমরূপে সম্পাদনের নাম ইহসান। এই ইহসানই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তৃতি

মানুষের গোটা জীবনের জন্যই রয়েছে ইসলামের দিক-নির্দেশনা। অতএব মানুষের গোটা জীবন জুড়েই রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপ

❖ কোন কাজ “বিসমিল্লাহ” বলে শুরু করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কেউ “আস্‌সালামু আলাইকুম” বলে সম্বোধন করলে জওয়াবে

ইসলামী সংস্কৃতি-১

"ওয়াআলাইকুমুস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ" অথবা "ওয়া আলাইকুমুস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কেউ যখন জিজ্ঞেস করে "আপনি কেমন আছেন" তখন "আলহামদুলিল্লাহ" বলে জওয়াব দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" বললে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে তার জন্য দুআ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ হাই উঠলে বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে মুখ-গহ্বর আড়াল করা এবং "লা হাওলা ওয়া লা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কেউ কাউকে কিছু দিলে 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরান" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন খুশির খবর শুনলে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কারো ইন্তিকালের খবর শুনলে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন কাজ ভবিষ্যতে করার সংকল্প ব্যক্ত করা কালে "ইনশাআল্লাহ" যুক্ত করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" নাম উচ্চারিত হলে "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন বিপদ কেটে যাবার পর এবং আল্লাহর কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করার পর সাজদা করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বেহুদা কথা না বলা এবং বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কাউকে বিদ্রূপ না করা, মন্দ নামে আখ্যায়িত না করা, আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ না করা এবং গীবাত করা থেকে বিরত থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে কারো সহযোগিতা না করা ইসলামী সংস্কৃতি।

- ❖ বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ না করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কোন প্রয়োজনে কারো বাড়িতে গিয়ে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে না থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কেউ দাওয়াত দিলে বিশেষ অসুবিধা না থাকলে দাওয়াত কবুল করা এবং খাবার খেয়ে খোশগল্পে মগ্ন না হয়ে যথাশীঘ্র বিদায় গ্রহণ করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন কালে ডান দিক থেকে শুরু করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ "বিসমিল্লাহ্" বলে খাদ্য খাওয়া কিংবা পানীয় পান শুরু করা, ডান হাতে খাওয়া, ডান হাতে গ্লাস ধরা, বরতনের নিজের দিক থেকে খাবার খেতে থাকা এবং খাওয়া শেষে "আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ আহার করা কালে ঠেসে ঠেসে আহার্য দিয়ে পেট ভর্তি না করে পেটের একাংশ খালি রেখে আহার পর্ব শেষ করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ বরতনে তুলে নেয়া খাদ্য পুরোপুরি খেয়ে নেয়া এবং বরতনে লেগে থাকা ঝোল আংগুল দিয়ে ভালোভাবে চেটে খাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ আহার শেষ করে আংগুল চেটে খাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ এক নিশ্বাসে পানীয় পান না করে দুই তিন নিশ্বাসে তা পান করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ পরিবেশিত খাদ্য পছন্দ হলে খাওয়া, অপছন্দ হলে না খেলেও বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ আগন্তুককে হাসিমুখে সালাম জানিয়ে, মুসাফাহা করে রিসিভ করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ মেহমানকে বিদায় দেয়াকালে মুসাফাহা করা, "আস্তাওদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া আখিরু আমালিকা" বলা এবং সালাম বিনিময় করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ ওয়া

লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলে ঘর থেকে বের হওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বাহনে আরোহণ করা কালে “বিসমিল্লাহ” বলা, বাহনে বসে “আলহামদুলিল্লাহ” বলা এবং “সুবহানাল্লাযি সাখ্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন” বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ চলার পথে উঁচুস্থানে ওঠারকালে “আল্লাহু আকবার” এবং নীচের দিকে নামারকালে “সুবহানাল্লাহ” বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ সফরকালে কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করে তিনবার “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাত মিন্ শাররি মা খালাক” বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বাইরে থেকে এসে, বাহন থেকে নেমে ঘরের প্রবেশ পথে পৌঁছে, ঘরের লোকদেরকে “আস্‌সালামু আলাইকুম” বলে সম্বোধন করে ঘরে প্রবেশ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বিজ্ঞজনোচিতভাবে, যুক্তি দ্বারা শক্তিশালী করে, সুন্দর বক্তব্য সহকারে লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ উস্কানীমূলক কথার মুকাবিলায় ধৈর্য অবলম্বন করা এবং মন্দ আচরণের মুকাবিলায় ভালো আচরণ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ নির্দিষ্ট ইমামের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইমামত না করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন স্থানের বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির নির্দিষ্ট আসনে তাঁর অনুমতি ছাড়া না বসা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ঢোল বাজিয়ে নয়, বিউগল ফুঁকে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয় কিংবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন না করে “আল্লাহু আকবার”, “আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” প্রভৃতি বাক্য উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে বুলন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করে লোকদেরকে ছালাতের জন্য ডাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল

আফ্ওয়া ওয়াল আফিআতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরা” পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ছালাতের অযুর আগে দাঁত পরিষ্কার করে নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কাঁচা রসূন কিংবা পেয়াজ খেলে মুখ থেকে এইগুলোর দুর্গন্ধ দূর করে তবেই মাসজিদে যাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ছালাত আদায়ের জন্য “বিসমিল্লাহ” বলে শুরু করে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে, কুলি করে, নাক সাফ করে, চেহারা ধুয়ে, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে, মাথা মসেহ করে এবং দুই পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে অযু সম্পন্ন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ভালোভাবে অযু করে, পাক-সাফ পোষাক পরে, মাসজিদে গিয়ে, আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতির অনুভূতি মনে জাগ্রত রেখে, গভীর মনোযোগের সাথে, ধীরে সুস্থে ছালাত বা নামায আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ পুরুষদের মাসজিদে গিয়ে ইমামের কমাণ্ডে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং জুমাবার ছালাতুল জুমু‘আ আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ জুমাবার ছালাতুল জুমুআর আগে ইমামের আলকুরআন ও আস্সুন্নার ভিত্তিতে দিক-নির্দেশনামূলক খুতবা দেয়া এবং শ্রোতাদের তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মাসজিদে প্রবেশের সময় “আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা” এবং মাসজিদ থেকে বেরুবার সময় “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা” পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মাসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রাখা এবং মাসজিদ থেকে বেরুবার কালে প্রথমে বাম পা রাখা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ অন্যান্য দিনের তুলনায় জুমাবার বেশি বেশি দরূদ পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আল্লাহর রাসূলের (সা) শেখানো, ছালাতের শেষে এবং দিন রাতের বিভিন্ন সময়ে পঠিতব্য দুআগুলো নিয়মিতভাবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ছালাতুজ্ জুহর আদায় করে, দুপুরের আহার সমাপ্ত করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ছালাতুল ফাজরের পর না ঘুমিয়ে রিযকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ রমাদান মাসে শেষ রাতে সাহরী খেয়ে পরদিন ছাওম পালনের নিয়াত করে, ছুবহে ছাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থেকে, দিনের শেষে সূর্য ডোবার সাথে সাথে খেজুর কিংবা পানি দ্বারা ইফতার করে ছাওমের সমাপ্তি ঘটানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বিস্তৃত এলাকার লোকেরা বড়ো কোন ময়দানে সমবেত হয়ে পহেলা শাওয়াল ছালাতুল ঈদুল ফিতর, দশই যুলহিজ্জা ছালাতুল ঈদুল আদহা আদায় করা এবং মনোযোগ সহকারে ইমামের খুতবা শুনা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ এক পথে ঈদের ময়দানে যাওয়া এবং আরেক পথে ফিরে আসা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ঈদের ময়দানে যাওয়া ও আসার সময় "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ" পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কুরবানীর পশুর গোশত নিজের প্রয়োজন মতো রেখে বাকিটুকু আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ঈদের দিনে কিংবা বিয়ে উপলক্ষে, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র পরিহার করে, শুধুমাত্র দফ (এক মুখ খোলা ঢোলক) বাজিয়ে, ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক শব্দাবলী বিবর্জিত, অশ্লীলতা মুক্ত শব্দ সম্বলিত (নারী ও পুরুষের পৃথক অংগনে) গান গাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ঈদের দিন একে অপরের বাড়িতে যাওয়া এবং একে অপরকে আপ্যায়িত করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ঈদুল ফিতরের দুই চার দিন আগেই ছাদাকাতুল ফিতর বাইতুল মালে জমা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বছর পূর্ণ হলেই নগদ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, ব্যবসার মূলধন, গরু-ছাগল-ভেড়া-উট ইত্যাদির যাকাত পুংখানুপুংখরূপে হিসাব করে বের করে বাইতুল মালে জমা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমিতে নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে উশর এবং সেচ দ্বারা সিক্ত জমিতে নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে নিছফুল উশর আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বিত্তবান মুমিনদের মাক্কার পথে নির্দিষ্ট মিকাতে পৌছে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ শুরু করা, মাক্কায় পৌছে কা'বার তাওয়াফ করা, আছ ছাফা ও আলমারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করা, ৮ই যুলহিজ্জা মিনাতে অবস্থান করা, ৯ই যুলহিজ্জা আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা, ৯ই যুলহিজ্জা সন্ধ্যার পর রওয়ানা হয়ে মুজদালিফা এসে রাত্রি যাপন করা, ১০ই যুলহিজ্জা সকালে মিনাতে পৌছে তিনটি জামরাতে পাথর মারা, কুরবানী করা, মাথা মুড়িয়ে ফেলা কিংবা মাথার চুল ছোট করা, ইহরাম খুলে ফেলা, মিনা থেকে মাক্কায় গিয়ে কা'বার তাওয়াফ করা, আবার মিনাতে এসে ১১ ও ১২ই যুলহিজ্জা মিনাতে অবস্থান করা ও জামরাগুলোতে পাথর মারা, ১২ই যুলহিজ্জা সূর্যাস্তের পূর্বে মাক্কায় আসা অথবা ১৩ই যুলহিজ্জা জামরাগুলোতে আবার পাথর মেরে মাক্কায় আসা এবং তাওয়াফ করে হাজ সমাপন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ইহরাম বাঁধার পর থেকে শুরু করে ১০ই যুলহিজ্জা মিনাতে তিনটি জামরাতে পাথর মারা শেষ করা পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দু'আ বাদে সর্বদা সরবে "লাব্বাইকা আলাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা" তালবিয়া পাঠ করতে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ যুলহিজ্জা মাসের ৯ তারিখ ছালাতুল ফাজর থেকে ১৩ তারিখ ছালাতুল আছর পর্যন্ত ফারয ছালাতের পর তিনবার করে "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ" পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ প্রতিদিন যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে অর্থের দিকে নজর রেখে ধীরে সুস্থে এবং মধুর কণ্ঠে আলকুরআন অধ্যয়ন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ সহকারে বক্তৃতা–ভাষণ শুরু করা এবং আলকুরআন ও আস্‌সুন্নার নিরিখে শ্রোতাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মানুষকে হাসাবার জন্য মিথ্যা কাহিনী না বানিয়ে, রসিকতা করতে চাইলে সত্য কথাকেই রসাত্মকভাবে ব্যক্ত করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরবর্তী জেনারেশনকে আলকুরআন ও আলহাদীসের জ্ঞান-সমৃদ্ধরূপে গড়ে তোলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, ইসলামের সৌন্দর্য পরিস্ফুটন এবং ইসলাম অনুশীলনের প্রেরণা যোগানোর জন্য ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক শব্দাবলী পরিহার করে শ্রুতিমধুর ছন্দ সম্বলিত কবিতা রচনা করা ও আবৃত্তি করে শুনানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ইসলামী শারীয়ার সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে, বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে, আকর্ষণীয় বাক্য বিন্যাস সহকারে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ রচনা করা ও প্রকাশ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়াই যে মানুষের কর্তব্য এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণই যে মানুষের কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ তা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিঠি লেখা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ অক্ষর অলংকৃত করে আলকুরআনের আয়াত, বিভিন্ন হাদীস কিংবা আলকুরআন ও আস্‌সুন্নার শিক্ষা সম্বলিত কোন বাণী লেখা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ পরিবার সদস্যদের সংকুলান হওয়ার মতো প্রশস্ত, মহিলা ও পুরুষদের প্রাইভেসি নিশ্চিত করার উপযোগী, সুপরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নির্মাণ ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বসত বাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, আসবাবপত্র সঠিক স্থানে সংস্থাপন করা, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা এবং প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু দিয়ে গৃহ না সাজানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ নতুন চাঁদ দেখে "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইকা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্‌সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহু হিলালু রুশদিন ওয়া খাইরিন" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ নতুন পোষাক পরিধান করে "আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি কাসানী মা ওয়ারী বিহী 'আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ পুরুষের সোনা-রূপার অলংকার ও রেশমী কাপড় না পরা এবং মহিলাদের সোনা-রূপার অলংকার ও রেশমী কাপড় পরা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য, শীত কিংবা গরম থেকে শরীরকে বাঁচানোর জন্য, শোভাবর্ধনের জন্য, যথেষ্ট ঢিলা, নারী ও পুরুষের পোষাকের পার্থক্য বজায় রেখে, পুরুষের টাখনুর উপরিভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত পোষাক পরিধান করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ উপুড় হয়ে না শোয়া এবং কাত হয়ে বা চিত হয়ে শোয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ শয্যা গ্রহণ করে "আল্লাহুম্মা বি-ইসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া" এবং ঘুম থেকে জেগে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌নুশূর" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ পায়খানায় প্রবেশ করে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবাইস" বলা, পায়খানা শেষে বাম হাতে শৌচ কাজ করা এবং পায়খানা থেকে বেরিয়ে "গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানী" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কিছু দিন পরপর হাত-পায়ের নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের লোম ছেঁচে ফেলা এবং মাথার চুল ছাঁটিয়ে নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ভিন্‌ নারীর ওপর দৃষ্টি পড়লে পুরুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া এবং ভিন্‌ পুরুষের ওপর দৃষ্টি পড়লে নারীর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কনে পক্ষ ও বর পক্ষের মাঝে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সম্মুখে কনের আব্বা কর্তৃক কনের সম্মতি গ্রহণ, ঐ সাক্ষীদের সম্মুখে বরের সম্মতি গ্রহণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে একজন যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক মাস্‌নূন খুতবা প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

- ❖ নববধূকে বাড়িতে এনে পাত্রপক্ষের ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ বিয়ের সময় শোভন পরিমাণ মাহর নির্ধারণ করা, সন্তুষ্টচিত্তে মাহর আদায় করা, স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করা, সুন্দরভাবে তার ভরণ-পোষণ করা, তার সহযোগিতার জন্য কাজের লোক রাখা এবং স্ত্রী যাতে সুন্দরভাবে সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে পারে সেই জন্য নিজের সামর্থ অনুযায়ী তার হাতে টাকা-পয়সা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্যে যাওয়ার কালে "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা" পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ গৃহ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে মহিলাদের সারা শরীর জিলবাব কিংবা বোরখা দ্বারা ঢেকে নেয়া এবং নাকের ওপর দিয়ে নিকাব জড়িয়ে গাল ও ঠোঁট (যা দারুণভাবে পুরুষকে আকৃষ্ট করে) ঢেকে নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ মহিলাদের মাসজিদে গেলে পেছনের সারিতে দাঁড়ানো, ঈদের ময়দানে পৃথক স্থানে অবস্থান গ্রহণ এবং পথ চলার সময় রাস্তার একপাশ ধরে পথ চলা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কারো ঘরে উঁকি না মারা, কারো দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানতে না চাওয়া এবং কারো ব্যক্তিগত চিঠিপত্র না পড়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ মেহদি লাগিয়ে মহিলাদের হাত রাঙানো ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, নরম কাপড়ে মুড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ নবজাত শিশুর মুখে খেজুর চিবিয়ে একটু রস কিংবা সামান্য একটু মধু দিয়ে তাহনিক করা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর সপ্তম দিনে পশু যবাই করে তার গোশত আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীদের মধ্যে বিতরণ করা এবং শিশুর একটি সুন্দর নাম রাখা ইসলামী সংস্কৃতি।
- ❖ শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত মাতৃস্তনের দুধ পান করানো এবং বড়ো না হওয়া পর্যন্ত তাকে মাতৃস্নেহ সিক্ত রাখা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ছোট বেলা বালকদের খাতনা করানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ সাত বছর বয়সে সন্তানকে ছালাতের তাকিদ দেয়া এবং দশ বছর বয়সে প্রয়োজনে শাস্তি দিয়ে ছালাতে অভ্যস্ত করে তোলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ অশ্লীল কথা, বেহুদা কথা ও বাচালতা পরিহার করে প্রয়োজনীয় কথা ও পরিমিত কথা বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ উচ্চস্বরে কিংবা খুব নীচু স্বরে কথা না বলে গলার আওয়াজ মধ্যম মানে রেখে কথা বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কথায় ও আচরণে লজ্জাশীলতার প্রতিফলন থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ অট্টহাসি না হাসা, খিলখিলিয়ে না হাসা এবং মুচকি হাসি হাসা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ উদ্ধতভাবে পথ চলা কিংবা কাহিলভাবে পথ চলা পরিহার করে ভদ্রভাবে ও বলিষ্ঠভাবে পথ চলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ তাড়াহুড়া পরিহার করে সুস্থিরতার সাথে কাজকর্ম করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং হালালভাবে যা কিছু উপার্জিত হয় তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ অপব্যয়-অতিব্যয় পরিহার করা, কৃপণতা পরিহার করা এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ রাগ দেখিয়ে নয়, ধমকিয়ে নয়, কাজের গুরুত্ব বুঝিয়ে এবং কর্তব্যানুভূতি জাগ্রত করে লোক পরিচালনা করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কারো মাঝে আপত্তিকর কিছু দেখলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে, শান্ত মেজাযে ও নরম ভাষায় সেই বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কাজের লোককে গালি না দেয়া, মারধোর না করা, নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়ানো, নিজে যেমন কাপড় পরবে তাকে তেমন কাপড় পরানো এবং সাধ্যাতীত কোন কাজ তার ওপর না চাপানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ প্রতিবেশীর কোন খুশির ব্যাপার ঘটলে তাঁকে অভিনন্দন জানানো এবং বিপদ ঘটলে তাঁকে সান্তনা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ প্রতিবেশীদেরকে মাঝে মধ্যে ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য কিংবা অন্য কোন সামগ্রী উপহার দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ গৃহ-পালিত পশুগুলোকে নিয়মিত খাদ্য ও পানি দেয়া এবং রোগ হলে চিকিৎসা করানো ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন পশু যবাই করতে হলে পশুকে কিবলামুখী করে শুইয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ধারালো ছুরি দিয়ে যবাই করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ পণ্যদ্রব্যে কোন ত্রুটি থাকলে ক্রেতাকে তা অবহিত করা এবং মাপ ও ওজনে কমবেশি না করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খাইরিন মা আরসালতা বিহী ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা আরসালতা বিহী" পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বজ্রধ্বনির সময় "আল্লাহুম্মা লা তাক্‌তুল না বিছায়েকেকা ওয়ালা তুহ্‌লিকনা বিআযাবিকা ওয়া 'আফিনা কাবলা যালিকা" পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ বৃষ্টিপাতের সময় "আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফিআন" পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আব্বা-আম্মা ও অন্য মুরব্বীদেরকে নাম ধরে না ডাকা, অভদ্রভাবে তাঁদের সাথে কথা না বলা, তাঁদের আগে আগে না চলা এবং তাঁরা না বসা পর্যন্ত নিজে না বসা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ আব্বার ইন্তিকালের পর আল্লাহর নির্ধারিত হার অনুযায়ী অনতিবিলম্বে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানদের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ সুযোগ পেলেই দীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ জনগণের সাথে মেলামেশা করা এবং মেলামেশাজনিত কষ্ট সহ্য করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কাউকে কোন কথা দিলে যেই কোন মূল্যে তা রক্ষা করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ডান হাতে মুসাফাহা করা, উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা, ডানদিক থেকে অযু-গোসল, কাপড় পরা, মোজা-জুতা পরা, চোখে সুরমা লাগানো, নখকাটা শুরু করা এবং বাম হাতে নাক সাফ করা, মোজা-জুতা খোলা ও শৌচ কাজ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ চোখে সুরমা লাগানো ও অংগে আতর ব্যবহার করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ রোগীকে দেখতে গিয়ে তার কুশলাদি জেনে, "আযহিবিল বা'সা রাব্বান নাস্ ওয়াশফি আনতাশ্ শাফী লা শিফাআন ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মৃত্যু পথযাত্রীর শিয়রে বসে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তালকীন দিতে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মৃতের জন্য বিলাপ না করা ও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে না ফেলে, নদীতে ভাসিয়ে না দিয়ে কিংবা পাহাড়ের ওপর ফেলে না রেখে অযু-গোসল দিয়ে, সাদা কাপড়ের কাফন পরিয়ে, সালাতুজ জানাযা আদায় করে কবরে নামিয়ে "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ" বলে কিবলার দিকে কাত করে শুইয়ে দিয়ে দাফন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কবর পাকা না করা, কবরে বাতি না দেয়া এবং কবরের নিকটে গেলে "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লা-হিকূন" বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কারো দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়ে গেলে সংগে সংগে "আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যানবিওয়াতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়ে তাওবা করা, এই কাজের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং এই সংকল্পের ওপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ যুদ্ধের ময়দানে বে-সামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ না করা, নারী ও শিশুদের হত্যা না করা, পলায়নরত শত্রু সেনার ওপর হামলা না চালানো, বন্দী শত্রু সেনার ওপর দৈহিক নির্যাতন না চালানো এবং বন্দী শত্রু সেনাকে অভুক্ত না রাখা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দিলে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ ইসলামের শিক্ষাকে স্বল্প সময়ে গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন বস্তুগত উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ কালে অনুসৃতব্য নীতি বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রধানের খুতবা বা ভাষণ দান ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ গোটা পৃথিবীতে ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মানের সার্বিক শক্তি-সামর্থ অর্জন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

❖ কোন বিষয় হালাল না হারাম– এই সম্পর্কে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা পরিহার করে চলা ইসলামী সংস্কৃতি।

উপসংহার

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের তীব্র আকাংখাই সংস্কৃতির একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক শক্তি।

এই নিয়ন্ত্রক শক্তির অনুপস্থিতি মানুষকে এমন সব কর্মকাণ্ড উদ্ভাবন ও অনুশীলনে প্ররোচিত করে যেইগুলোকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সংস্কৃতি বলে প্রচার করা হলেও আসলে সেইগুলো সংস্কৃতি নয়, অপ-সংস্কৃতি।